কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২২
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ৯

সূরা আছর

কুরআনের ১০৩ তম সূরা। এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর আয়াত সংখ্যা ৩ টি। 'আসর' এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সময়, যেটা শেষ হয়ে আসছে।

নামকরণ :

প্রথম আয়াতের " আল আসর " শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

শানে নুযূল

জাহিলিয়া যুগে আব্দু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে কালাদাহ ইবনে উসায়েদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কালাদাহ প্রায়ই তার নিকট যাতায়াত করতো।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঈমান গ্রহণের পর একদিন সে তার নিকট এসে বললো, "হে আবু বকর! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ? ব্যবসা-বাণিজ্যে তো ভাটা লেগেছে। আয়-রোজগারের পথ তো প্রায় বন্ধ। তুমি কোন ধারণায় নিমজ্জিত হয়েছো ? নিজেদের ধর্মকর্মও হারিয়েছ এবং দুনিয়াও হারিয়েছ। তুমি এখন উভয় দিক দিয়ে পূর্ণরূপে লোকসানে নিপতিত।"

আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "হে নির্বোধ! যে লোক আল্লাহ তাআলা ও তার রাসুলের গোলাম হয়ে যায়, সে কখনো লোকসানে নিপতিত হয় না। যারা পরকাল সম্পর্কে কোনই চিন্তাভাবনা করে না মূলত তারাই ক্ষতিগ্রস্ত, তারাই লোকসানে নিপতিত। যারা কেবল জাগতিক উন্নতি লাভের জন্যই সদা চিন্তামগ্ন ও ব্যস্ত থাকে, তারাই একূল-ওকূল উভয় কূলই হারায়।"

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কথার সত্যতা প্রমাণ এবং এ ঘটনাকে উপলক্ষ করে এ সূরা অবতীর্ণ হয়।

আগের ও পরের সূরার সাথে সম্পর্কঃ

সূরা আত তাকাসূর এ মূলত বর্ননা করা হয়েছে যে মানুষ গাফিলতিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে এবং তা তাকে কবর পর্যন্ত পৌছে নিয়ে যায় এবং তা শেষ পর্যন্ত জাহান্নাম পর্যন্ত নিয়ে যায়। ১০৩ নং সূরা আল আসর এ বলা হয়েছে যে ঐ কবরে যাওয়ার আগেই সময় থাকতে জেগে উঠে ভালো কাজ করতে হবে আর যারা না করবে তারা ক্ষতি ('খুসর') এর মধ্যে নিমজ্জিত। আগের সূরার শেষে বলা হয়েছে মানুষকে নিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে, এই সূরার শুরুতেই অন্যতম বড় নেয়ামত 'সময়' এর কথা বলা হয়েছে।

সূরা আল আসর এ সময়কে গুরুত্ব দিয়ে ৪ টি কাজ করতে বলা হয়েছে। ঈমান আনা, সৎকাজ করা, সত্যের উপদেশ দেওয়া, ধৈর্য্যের উপদেশ দেওয়া। এর পরের সূরা; ১০৪ নং সূরা আল হুমাঝাহ এ গুরুত্বহীন ৪ টি কাজ এর কথা বলা হয়েছে। সামনে নিন্দা করা, পিছনে নিন্দা করা, অর্থ জমা করা এবং তা গুণে গুণে রাখা, অর্থ চিরকাল থাকবে মনে করা।

সূরার ফজিলত

উবায়দুল্লাহ ইবনে হিসন রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে দুই ব্যক্তি ছিলেন, তারা পরস্পর মিলে একজন অন্যজনকে সূরা আসর পাঠ করে না শুনানো পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতেন না। (তিবরানী)

ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ বলেন, "যদি মানুষ কেবল এ সূরাটি সম্পর্কেই চিন্তা করতো, তবে এটিই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল।" (ইবনে কাসির)

وَ الْعَصْرِ ﴿۱﴾

১. সময়ের শপথ

والعصرশব্দটির প্রথম অক্ষর و (ওয়াও) শপথের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একে কসমিয়া বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদের বিভিন্ন স্থানে তারই কোন সৃষ্টির নামে শপথ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা কোন জিনিসের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য শপথ করেন না। বরং তিনি যে কথা বলতে চান সেই জিনিস তার সত্যতা প্রমান করে বলেই তিনি তাঁর শপথ করেন। সুতরাং এখানে কালের নামে শপথ করার অর্থ হলো এই সুরায় যে চারটি গুণের কথা বলা হয়েছে যাদের মধ্যে তা থাকবে সে সব লোক ছাড়া বাকি সবই সে মহাক্ষতি ও ধ্বংশের মুখোমুখি - কাল সময় ও স্রোত তার জন্য জলন্ত প্রমাণ। কাল সাইকেলের চাকার মত ঘূর্ণায়মান। এখানে বর্তমান ভবিষ্যত ও অতীত কালকেই বুঝানো হয়েছে। চলমান সময় ও স্রোতের শপথ করার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝানোর জন্য প্রথমতঃ যে বিষয়টি মনে রাখা দরকার তাহলো এই যে, কালের সে অংশটা এখন চলছে তা আসলে দুনিয়ার কাজ করার জন্য প্রতিটি ব্যক্তি এবং প্রতিটি জাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া সময় বা সুযোগ। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, পরীক্ষার হলে পরিক্ষার্থীকে প্রশ্নের দেবার জন্য সময় বেধে দেয়া হয়। যে সেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগায়। ফলে সে ভাল ফলাফলের মাধ্যমে পরীক্ষায় উত্তীর্ন হয়। অনুরুপ ভাবে আল্লাহ মানুষের হায়াত বা আয়ুষ্কাল নিদিষ্ট করে দিয়েছেন। সেই নির্ধারিত আয়ুষ্কালের মধ্যেই মানুষ যদি পরীক্ষারর্থীর মতো প্রতিটি মুহূর্তকে কল্যানকর এবং সঠিক পথে কাজে লাগায় তাহলে সে সফলতার মাধ্যমে আখেরাতের মহা ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারে। সুতরাং মহাক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য সে ভালো কাজ কাজ করতে হবে তা বেঁধে দেওয়া আয়ুষ্কালের মধ্যেই করতে হবে। এতে বোঝা যায় সময়ই হলো আমাদের জীবনের আসল মূলধন। ইমাম রাযী (র) এ বিষয়ের উদাহরণ হিসাবে একজন মনীষীর উক্তি উল্লেখ করেছেন; তাহলো- "একজন বরফ বিক্রেতার কথা হতেই আমি সুরা আল আসরের অর্থ বুঝতে পেরেছি যে বাজারে জোর গলায় বলছিল- দয়া করো এমন এক ব্যক্তির প্রতি যার পূজি গলে যাচ্ছে। দয়া করে এমন ব্যক্তির প্রতি যার পূজি গলে যাচ্ছে। তার এ কথা শুনে আমি বললাম এইটিই হচ্ছে আসলে والعصر- إن الانسان لفى خسر-   বাক্যের অর্থ। মানুষকে যে আয়ুষ্কাল দেওয়া হয়েছে তা বরফ গলে

যাওয়ার মতো দ্রুত অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। একে যদি নষ্ট করে দেওয়া হয় অথবা ভুল কাজে ব্যয় করা হয় তাহলে সেটিই মানুষের জন্য ক্ষতি। কাজেই চলমান সময়ের কসম খেয়ে এই সুরায় যা বলা হয়েছে তার অর্থ এই যে, এই দ্রুত গতিশীল সময় সাক্ষ্য দিচ্ছে, এই চারটি গুণাবলী শূন্য হয়ে যে মানুষ যে কাজেই নিজের জীবনকাল অতিবাহিত করে- তার সবটুকুই ক্ষতির সওদা ছাড়া কিছুই নয়। পরীক্ষার হলে যে ছাত্র প্রশ্ন পত্রের উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে অন্য কাজে সময় নষ্ট করেছে, তাকে পরীক্ষার হলে টানানো ঘড়ির কাঁটা বলে দিচ্ছে তুমি নিজের ক্ষতি করছো। যে ছাত্র এই সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত নিজের প্রশ্ন পত্রের জবাব দেবার কাজে ব্যয় করেছে একমাত্র সেই লাভবান।

اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لَفِیۡ خُسۡرٍ ۙ﴿۲﴾
২. নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মাঝে নিপতিত

ইনছান শব্দটি একবচন। এখানে মানুষ বলে সমস্ত মানুষই উদ্দেশ্য। কারণ, পরের বাক্যে চারটি গুণ সম্পন্ন লোকদেরকে তার থেকে আলাদা করে নেয়া হয়েছে। তাই এটা অবশ্যি মানতে হবে যে, এখানে মানুষ শব্দটিতে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ সমানভাবে শামিল। কাজেই উপরোল্লিখিত চারটি গুণাবলী কোন ব্যক্তি, জাতি বা সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যার-ই মধ্যে থাকবে না। সেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এই বিধানটি সর্বাবস্থায় সত্য প্রমাণিত হবে।

এখন দেখা যাক 'ক্ষতি' শব্দটি কুরআন মজীদে কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আভিধানিক অর্থে ক্ষতি হচ্ছে লাভের বিপরীত শব্দ। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এ শব্দটির ব্যবহার এমন সময় হয় যখন কোন একটি সদায় লোকসান হয়। পুরা ব্যাবসাটায় যখন লোকসান হতে থাকে তখনো এর ব্যবহার হয়। আবার সমস্ত পূঁজি লোকসান দিয়ে যখন কোন ব্যবসায়ী দেউলিয়া হয়ে যায় তখনো এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কুরআন মজীদ এই একই শব্দকে নিজের বিশেষ পরিভাষায় পরিণত করে কল্যাণ ও সফলতার বিপরীত অর্থে ব্যবহার করছে। কুরআনের সাফল্যের ধারণা যেমন নিছক পার্থিব সমৃদ্ধির সমার্থক নয় বরং দুনিয়া থেকে নিয়ে আখেরাত পর্যন্ত মানুষের প্রকৃত ও যথার্থ সাফল্য এর অন্তরভুক্ত , অনুরূপভাবে তার ক্ষতির ধারণাও নিছক পার্থিব ব্যর্থতা ও দুরবস্থায় সমার্থক নয় বরং দুনিয়া থেকে নিয়ে আখেরাত পর্যন্ত মানুষের সমস্ত যথার্থ ব্যর্থতা ও অসাফল্য এর আওতাভুক্ত হয়ে যায়।

এই সংগে একথাটিও ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে , যদিও কুরআনের দৃষ্টিতে আখেরাত মানুষের সাফল্যই তার আসাল সাফল্য এবং আখেরাতে তার ব্যর্থতাই আসল ব্যর্থতা তবুও এই দুনিয়ায় মানুষ যেসব জিনিসকে সাফল্য নামে অভিহিত করেছ তা আসলে সাফল্য নয় বরং এই দুনিয়াতেই তার পরিণাম ক্ষতির আকারে দেখা দিয়েছে এবং যে জিনিসকে মানুষ ক্ষতি মনে করেছে তা আসলে ক্ষতি নয় বরং এই দুনিয়াতেই তা সাফল্যে পরিণত হয়েছে । কুরআন মজীদে বিভিন্ন স্থানে এই সত্যটি বর্ণনা করা হয়েছে।

কাজেই কুরআন যখন পূর্ণ বলিষ্ঠতার সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ে ঘোষণা দিচ্ছে , " আসলে মানুষ বিরাট ক্ষতির মধ্যে অবস্থান করছে " তখন এর অর্থ হয় দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানের ক্ষতি। আর যখন সে বলে , এই ক্ষতির হাত থেকে একমাত্র তারাই রেহাই পেয়েছে যাদের মধ্যে নিম্নোক্ত চারটি গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে , তখন এর অর্থ হয় ইহাকাল ও পরকাল উভয় জগতে ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পাওয়া এবং সাফল্য লাভ করা।

إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ۬ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿۳﴾
৩. কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আর পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছে হকের এবং উপদেশ দিয়েছে ধৈর্যের।

অর্থাৎ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে পারে কেবল চারটি গুণবিশিষ্ট মানুষ। যার মধ্যে প্রথম দু'টি হ'ল ব্যক্তিগত ও পরের দু'টি হ'ল সমাজগত। প্রথম দু'টির প্রথমটি হ'ল ঈমান এবং দ্বিতীয়টি হ'ল আমল। এর দ্বারা মানুষের মধ্যে লুক্কায়িত জ্ঞানশক্তি ও কর্মশক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। জ্ঞান যদি তাওহীদ বিশ্বাসের উপর ভিত্তিশীল হয়, তবে তার কর্ম হবে মঙ্গলময়। আর যদি তা না হয়, তবে তার কর্ম হবে অকল্যাণময়। মানুষের বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনে এদু'য়ের ফলাফল সুস্পষ্ট। যে জাতি ইলমী ও আমলী শক্তিতে উন্নত, সে জাতিই পৃথিবীতে উন্নত হয়। মুসলমানদের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস তার বাস্তব সাক্ষী। অতএব ক্ষতি থেকে বাঁচতে হ'লে মানুষকে নিম্নোক্ত চারটি গুণ অর্জন করতে হবে-

১) ঈমান
ব্যক্তিগত কাজ দুটির প্রথম কাজটি হলো : ঈমান

الذين أمنوا **অর্থ 'যারা ঈমান** আনে'। এর শাব্দিক অর্থ 'বিশ্বাস' প্রকৃত অর্থ হলো খোলা মনে নেয়া এবং নিষ্ঠাও দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করা। অতএব, ঈমানের মাধ্যম হলো তিনটি- (১) অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস। (২) মুখে স্বীকৃতি তা বিশ্বাস অনুযায়ী মুখে প্রকাশ। (৩) বাস্তবে কাজে পরিণত। অর্থাৎ অন্তরের বিশ্বাস অনুযায়ী মুখে প্রকাশ এবং সেই অনুযায়ী কাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন।

মুমিনের বিশ্বাসের ভিত্তি হ'ল ছয়টি : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ**(১)** আল্লাহর উপরে বিশ্বাস, (২) তাঁর ফেরেশতাগণের উপর বিশ্বাস, (৩) তাঁর প্রেরিত কিতাব সমূহের উপর বিশ্বাস, (৪) তাঁর প্রেরিত রাসূলগণের উপর বিশ্বাস, (৫) বিচার দিবসের উপর বিশ্বাস এবং (৬) আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস।

প্রকৃত ঈমান : পবিত্র কুরআন মজীদে যে ঈমানের কথা বলা হয়েছে তা হলো সন্দেহ সংশয় মুক্ত ঈমান । বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়ার এবং তার উপর দৃড়ভাবে টিকে থাকাকে প্রকৃত ঈমান বলেছে আল্লাহ পাক বলেন- -সেই সব লোকই প্রকৃত পক্ষে মুমিন যারা আল্লাহ ওতার রাসুলের প্রতি ঈমান আনার পর আর কোন রকম সন্দেহে পড়েনি। (হুজরাত -১৫) অন্য স্থানে - নিশ্চয়ই যারা বলে আল্লাহই আমাদের রব । অত:পর এই কথার উপর দৃঢ় ও অবিচল থাকে । (হামীম - সিজদাহ Ñ৩০) মুমিনের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন অর্থ :" প্রকৃত মুমিন তো হল সে সব লোক ,যাদের আল্লাহ তায়ালাকে ¯œরন করানো হলে তাদের হৃদয় কম্পিত হয় এবং যখন তাদের সামনে তার আয়াত সমূহ তেলায়াত করা হয় , তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা সমসময় তাদের মালিকের উপর নির্ভর করে" (আনফাল-২) উপরোক্ত আয়াত গুলিতে প্রমানিত হলোযে ,ঈমান আনার পর সন্দেহপোষন করা যাবেনা এবং তার উপর দৃঢ়ও অবিচল থাকতে হবে। মানুষের চরম ক্ষতিথেকে বাঁচার জন্য

যে ঈমানের কথা বলা হয়েছে তাহলো এধরনের ঈমান। এধরনের ঈমান যাদের মধ্যে নেই তারা কিছুতেই মহা ক্ষতি থেকে নিস্তার পেতে পারে না ।
ঈমানের ব্যাপারে মানুষ তিনভাগে বিভক্ত। (১) খালেছ বিশ্বাসী মুমিন (২) অবিশ্বাসী কাফের (৩) দোদুল্যমান কপট বিশ্বাসী। এদের মধ্যে জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে কেবলমাত্র প্রথম দল। শেষোক্ত দু'টি দল চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

বস্তুতঃ প্রত্যেক মুসলমানকে সর্বাগ্রে ঈমান সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এদিকে ইঙ্গিত করেই ইমাম বুখারী (রহঃ) ছহীহ বুখারীতে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, باب العلم قبل القول والعمل 'কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান অর্জন'। তিনি দলীল এনেছেন আল্লাহর নির্দেশ থেকে -فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ'তুমি জ্ঞান অর্জন কর এ বিষয়ে যে, কোন উপাস্য নেই আল্লাহ ব্যতীত এবং তোমার গোনাহের জন্য ক্ষমা চাও' (*মুহাম্মাদ ৪৭/১৯*)। এখানে কথা ও কাজের পূর্বেই ইলমের কথা বলা হয়েছে।

অতএব আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত 'ঈমান এনেছে' অর্থ 'জেনে-বুঝে ঈমান এনেছে'।

২) সৎকাজ

ঈমানের পরে মানুষকে ক্ষতি থেকে বাঁচাবার জন্য দ্বিতীয় যে গুণীট অপরিহার্য সেটি হচ্ছে সৎকাজ।

আল্লাহ বলেন, আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ তাদের আপ্যায়নের জন্য জান্নাত হবে তাদের বাসস্থান' *(সাজদাহ ৩২/১৯)*।

তিনি বলেন, ´যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই হ'ল সৃষ্টির সেরা'। 'তাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকটে চিরস্থায়ী বসবাসের বাগিচাসমূহ; যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদী সমূহ। যেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর উপরে সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে' *(বাইয়েনাহ ৯৮/৭-৮)*।

শরী'আত অনুমোদিত নেক আমলকেই 'সৎকর্ম' বলা হয়। যেমন সালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার, মানুষের প্রতি দয়া, ছোটদের প্রতি স্নেহ, বড়দের প্রতি সম্মান ইত্যাদি।

কুরআনের পরিভাষায় সালেহাত সমস্ত সৎকাজ এর অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের দৃষ্টিতে, যে কাজের মূলে ঈমান আছে এবং যা আল্লাহ ও তার রাসূল (সা:) প্রদত্ত হেদায়াতের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়েছে তা, সৎকাজ।

তাই কুরআন মজীদের সর্বত্র সৎকাজের আগে ঈমানের কথা বলা হয়েছে এবং এই সূরায়ও ঈমানের পরেই এর কথা বলা হয়েছে। কুরআনের কোন এক জায়গায়ও ঈমানে ছাড়া সৎকাজের কথা বলা হয়নি এবং কোথাও ঈমান বিহীন কোন কাজের পুরস্কার দেবার আশ্বাসও দেয়া হয়নি। অন্যদিকে মানুষ নিজের কাজের সাহায্যে যে ঈমানের সত্যতা প্রমান পেশ করে সেটিই হয় নির্ভরযোগ্য ও কল্যাণকর ঈমান । অন্যথায় সৎকাজ বিহীন ঈমান একটি দাবী ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ এই দাবী সত্ত্বেও যখন আল্লাহ ওতাঁর রসূল নির্দেশিত পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে তখন আসলে সে নিজেই তার এই দাবীর প্রতিবাদ করে। ঈমান ও সৎকাজের সম্পর্কে বীজ ও বৃক্ষের

মতো। বীজ মাটির মধ্যে না থাকা পর্যন্ত কোন বৃক্ষ জন্মাতে পারে না। কিন্তু যদি বীজ মাটির মধ্যে থাকে এবং কোন বৃক্ষ না জন্মায় তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় মাটির বুকে বীজের সমাধি রচিত হয়ে গেছে। এজন্য কুরআন মজীদে যতগুলো সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তা এমন সব লোকদেরকে দেয়া হয়েছে যারা ঈমান এনে সৎকাজ করে। এই সূরায়ও একথাটিই বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে , মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য দ্বিতীয় যে গুণটির অপরিহার্য প্রয়োজন সেটি হচ্ছে ঈমান আনার পর সৎকাজ করা । অন্য কথায় , সৎকাজ ছাড়া নিছক ঈমান মানুষকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না।

অতঃপর আমল কবুল হওয়ার শর্ত হ'ল তিনটি : (১) আক্বীদা বিশুদ্ধ (عقيدة صحيحة)হওয়া (২) তরীকা সঠিক (طريقة صحيحة)হওয়া এবং (৩) ইখলাছে আমল (إخلاص عمل)। অর্থাৎ কাজটি নিঃস্বার্থভাবে কেবলমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে হওয়া *(যুমার ৩৯/২)*। মোটকথা শিরক বিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস, সহীহ সুন্নাহর অনুসরণ এবং শ্রুতি ও প্রদর্শনীমুক্ত ইখলাছ, এই তিনটির সমন্বয় ব্যতীত আল্লাহর নিকটে বান্দার কোন সৎকর্মই কবুল হবে না এবং তাতে কোন ছওয়াবও সে পাবে না।

দু'টি সমাজগত গুণের প্রথমটি হ'ল -দাওয়াত

'পরস্পরকে হক-এর উপদেশ দেওয়া' (وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ)।

এটি হ'তে হবে আল্লাহর পথে পরকালীন স্বার্থে এবং আল্লাহ প্রেরিত হক-এর দিকে। যেমন আল্লাহ বলেন- ঐ ব্যক্তির চাইতে উত্তম কথা কার আছে, যে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে... *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৩)*। আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, 'তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে মানুষকে আহবান কর এবং অবশ্যই তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৭)*। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'দ্বীন হ'ল নছীহত'। প্রত্যেক মুমিন পরস্পরকে হক-এর উপদেশ দিবে। যেমন কাউকে শিরক কিংবা বিদ'আত করতে দেখলে বা কোন ফরয কাজে গাফলতি দেখলে তাকে বলবে, হে ভাই! শিরক বর্জন কর। ফরয কাজটি আগে সম্পন্ন কর। অনুরূপভাবে কাউকে কোন অন্যায় করতে দেখলে বলবে, হে ভাই! আল্লাহকে ভয় কর! অন্যায় থেকে বিরত হও।

'হক' হ'ল আল্লাহর বিধান। আল্লাহ বলেন, আর তুমি বল, হক আসে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে। অতঃপর যার ইচ্ছা তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করুক, যার ইচ্ছা তাতে অবিশ্বাস করুক। আমরা সীমালংঘনকারীদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি...' (*কাহফ ১৮/২৯*)।

মানুষের সীমিত জ্ঞান কখনো চূড়ান্ত সত্যে পৌঁছতে পারে না। তাই তাকে অহি-র বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। যা আল্লাহর পক্ষ হ'তে নবীগণের মাধ্যমে নাযিল হয়। ইসলামী শরী'আতে যা পূর্ণাঙ্গরূপ পরিগ্রহ করেছে। স্বার্থান্ধ ব্যক্তিরা যা পসন্দ করে না। তাই দুনিয়াবী জৌলুসে মোহমুগ্ধ এবং চটকদার যুক্তি ও সন্দেহবাদে আচ্ছন্ন ব্যক্তিদের ধিক্কার দিয়ে আল্লাহ বলেন, - 'সত্য তোমার প্রভুর কাছ থেকে এসেছে। অতএব তুমি সন্দেহবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' (*বাক্বারাহ ২/১৪৭; আলে ইমরান ৩/৬০; ইউনুস ১০/৯৪)*।

তিনি বলেন, 'তোমার প্রভুর বাক্য সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ। তাঁর বাক্যের পরিবর্তনকারী কেউ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' (*আন'আম ৬/১১৫*)।

সংখ্যা কখনোই সত্যের মাপকাঠি নয়। সে বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে পরের আয়াতেই আল্লাহ বলেন, 'আর যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চল, তাহ'লে ওরা তোমাকে আল্লাহর পথ হ'তে বিপদগামী করে দেবে। তারা তো কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং অনুমানভিত্তিক কথা বলে' (*আন'আম ৬/১১৬*)।

রাসূল (সাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে মানবজাতির কাছে দু'টি আমানত রেখে গেছেন। তিনি বলেন, –'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এ দু'টি বস্তুকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকবে, ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ'।

অতএব 'হক'-এর ব্যাখ্যা রাসূল (সাঃ) নিজেই দিয়ে গেছেন এবং নিজের নবুঅতী জীবনে সেই হক-এর প্রচার ও প্রতিষ্ঠা দান করে গেছেন। যদি বিশ্বকে অন্যায়-অনাচার ও অশান্তির দাবানল থেকে বাঁচাতে হয়, তাহ'লে পরস্পরকে আল্লাহ প্রেরিত 'হক' তথা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার উপদেশ দিতে হবে, অন্য কিছুকে নয় বা তাতে কোনরূপ যোগ-বিয়োগ নয়।

দাওয়াতের ফযীলত : মানুষের নিকট হক-এর এই দাওয়াত দেওয়া ফরয। রাসূল (সাঃ) এসেছিলেন 'আল্লাহর পথের দাঈ' হিসাবে (*আহযাব ৩৩/৪৬*)। তিনি বলেন,

(১) 'একটিমাত্র আয়াত হলেও তা আমার পক্ষ থেকে মানুষের নিকট পৌঁছে দাও...।'

(২) তিনি আরো বলেন, 'কেউ যদি কোন নেক কাজের পথনির্দেশ দেয়, সে ঐ নেক কাজ সম্পাদনকারীর সমতুল্য ছওয়াব পায়'।

(৩) রাসূল (সাঃ) বলেন, - 'যদি তোমার দাওয়াতের মাধ্যমে একজন লোককেও আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করেন, তবে সেটা তোমার জন্য সর্বোত্তম লাল উট কুরবানীর চাইতে উত্তম হবে'।

(৪) দাওয়াত এককভাবে বা সংঘবদ্ধভাবে দিতে হবে। আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, 'বল! এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহর দিকে, জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*।

(৫) দাওয়াত সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে দিতে হবে। রাসূল (সাঃ) বলেন 'যখন মানুষ অন্যায়কর্ম হ'তে দেখে, অথচ তা প্রতিরোধের চেষ্টা করে না। আল্লাহ সত্বর তাদের সকলের উপর তার বদলা নিবেন।' তিনি বলেন, কোন সম্প্রদায়ে যখন পাপ ছড়িয়ে পড়বে এবং সেই সমাজে ভাল লোকের সংখ্যা বেশী হওয়া সত্ত্বেও তারা তা প্রতিরোধের কোন চেষ্টা নিবে না, তখন তাদের সকলের উপর আল্লাহ ব্যাপক গযব নামিয়ে দিবেন'।

(৬) তিনি বল্ 'যে ব্যক্তি কাউকে হেদায়াতের পথে ডাকে, তার জন্য সেই পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে, যা তার অনুসারীদের জন্য রয়েছে। অথচ এটি তাদের ছওয়াব থেকে কোন অংশ কমাবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষকে ভ্রান্ত পথের দিকে ডাকে, তার জন্য সেই পরিমাণ গোনাহ রয়েছে, যা তার অনুসারীদের জন্য রয়েছে। অথচ এটি তাদের গোনাহ থেকে কোন অংশ কমাবে না'।

(৭) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রাঃ) সফরে বের হয়েছেন। এমন সময় তাঁকে তাঁর ছোট ভাই কুছাম (মৃ: ৫৭ হিঃ) অথবা কন্যার মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হ'ল। তিনি *ইন্না লিল্লাহ* পাঠ করলেন এবং বললেন, আল্লাহ লজ্জা নিবারণ করেছেন। খাদ্য ও পোষাক দান করেছেন। ছওয়াবও আল্লাহ দিবেন। অতঃপর রাস্তার একপাশে গিয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন এবং অনেকক্ষণ বসে রইলেন। অতঃপর সওয়ারীর দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় সূরা বাক্বারাহ ৪৫ আয়াতটি পাঠ করলেন। যার অর্থ 'তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর' *(ইবনু জারীর, কুরতুবী, ইবনু কাছীর; বাক্বারাহ ২/৪৫)*। এই ঘটনার মধ্যে আল্লাহর পথে দাওয়াতের

ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরামের গভীর নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থ আন্তরিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ দাওয়াতের মাধ্যমেই দ্বীন বেঁচে থাকে।

(৮) আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রাঃ) সপ্তাহে প্রতি শুক্রবার অথবা সপ্তাহে বেশীর বেশী দুই বা তিনদিন মানুষকে ডেকে মজলিস করে দাওয়াত দিতে বলতেন। অনুরূপভাবে ইবনু মাসঊদ (রাঃ) প্রতি বৃহস্পতিবারে দাওয়াত দিতেন।

আয়াতে বর্ণিত দু'টি সমাজগত গুণের দ্বিতীয় হ'লঃ সবর

(৪) সবর (الصبر): সমাজগত গুণের দ্বিতীয়টি হ'ল, 'পরস্পরকে সবরের উপদেশ দেওয়া' (وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)। আল্লাহ বলেন, 'ধৈর্য্যশীল বান্দাদের বেহিসাব পুরস্কার দান করা হবে' *(যুমার ৩৯/১০)*।

'সবর' অর্থ 'যে কাজ করা উচিৎ নয়, সে কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা'। যেমন কোন রোগ-পীড়া বা বিপদাপদ হ'লে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া, হে ভাই! সবর কর। এটি তাক্বদীর, যা পূর্বেই লিপিবদ্ধ ছিল। দিশেহারা হয়ো না। আল্লাহর নিকটে এর উত্তম বদলা প্রার্থনা কর। যেমন মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের সান্ত্বনা দিয়ে রাসূল (সাঃ) নিম্নোক্ত দো'আটি পড়তে বলেন, اَللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا 'হে আল্লাহ! আমাকে বিপদে ধৈর্য ধারণের পারিতোষিক দান কর এবং আমাকে এর উত্তম প্রতিদান দাও'।] এমনিভাবে সালাতে জামা'আত থেকে গাফেল ব্যক্তিকে জামা'আতে উদ্বুদ্ধ করা, কৃপণ ব্যক্তিকে দানে উদ্বুদ্ধ করা, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে নাজী ফের্কাভুক্ত হবার ও সেকারণে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের উপদেশ দেওয়া, হারামে লিপ্ত ব্যক্তিকে হারাম থেকে বাধা দেওয়া ও হালাল-এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি।

বস্তুতঃ হক-এর উপদেশ দিলে বা হক-এর পথে দাওয়াত দিলে বাতিল ক্ষেপে যাবে। তারা হকপন্থীদের কণ্ঠ স্তব্ধ করার চেষ্টা করবে। তাদের উপরে নানাবিধ অত্যাচার চালাবে। এমতাবস্থায় হকপন্থী ব্যক্তিকে হক-এর উপরে দৃঢ় থেকে উপদেশ দান করতে হবে। কোন অবস্থাতেই হক থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না বা পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে বাতিলের সঙ্গে আপোষ করা যাবে না।

হক-এর অনুসারী হওয়ার অপরাধে বাতিলের পূজারী আবু জাহলদের অত্যাচারে নিগৃহীত বেলাল, খাববাব, খোবায়েব, আছেম, ইয়াসির পরিবার প্রমুখ সত্যসেবীগণ সবর ও দৃঢ়তার যে অতুল্য নমুনা রেখে গেছেন, যুগে যুগে তা সকল হকপন্থীর জন্য আদর্শ হয়ে থাকবে। ইয়াসির পরিবারের উপরে অমানুষিক নির্যাতনের মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে ব্যথাহত রাসূল (সাঃ) সেদিন তাদের সান্ত্বনা দিয়ে ছোট্ট একটি বাক্য উচ্চারণ করে বলেছিলেন 'সবর কর হে ইয়াসির পরিবার! তোমাদের ঠিকানা হ'ল জান্নাত'। তপ্ত মরুর বুকে নির্যাতিত ইয়াসির পরিবারের ব্যথিত হৃদয়ে রাসূল (সাঃ)-এর এই সান্ত্বনাবাক্য সেদিন যে শান্তির সুবাতাস বইয়ে দিয়েছিল, আজও তা হ'তে পারে যেকোন হকপন্থীর জন্য শক্তির আবেহায়াত। তবে এই সবর সর্বাবস্থায় নয়। বরং শক্তি থাকলে যালেমের যুলুম প্রতিরোধ করতে হবে এবং এজন্য সাধ্যমত শক্তি অর্জনের নির্দেশ এসেছে রাসূল (সাঃ)-এর মাদানী জীবনে *(আনফাল ৮/৬০)*। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকট উত্তম ও অধিক প্রিয় দুর্বল মুমিনের চাইতে'।

‘সবর’ তিন প্রকার :
(১) বিপদে সবর করা
(২) পাপ থেকে সবর করা অর্থাৎ বিরত থাকা
(৩) আল্লাহর আনুগত্যে সবর করা অর্থাৎ দৃঢ় থাকা
প্রথমটি ‘আম’ বা সাধারণ। দ্বিতীয়টি ‘হাসান’ বা সুন্দর এবং তৃতীয়টি ‘আহসান’ বা সবচেয়ে সুন্দর। যদি নাকি সবগুলি কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে হয়। আল্লাহ যেন আমাদেরকে সত্যের পথে উক্ত তিন প্রকার সবর এখতিয়ার করার তাওফীক দান করেন- আমীন!

সবরের ফযীলত :

(১) আল্লাহ বলেন, ‘আর তাদের সবরের পুরস্কার স্বরূপ তিনি তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোষাক দান করবেন’। ‘তারা সেখানে সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে তারা অতিশয় গরম বা অতিশয় শীত কোনটাই দেখবে না’ *(দাহর ৭৬/১২-১৩)*।

(২) তিনি বলেন, ‘তুমি ধৈর্য্যশীলদের সুসংবাদ দাও’। ‘যাদের উপর কোন বিপদ আসলে বলে, নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী’ *(বাক্বারাহ ২/১৫৫-৫৬)*।

(৩) সুহায়েব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, ‘মুমিনের ব্যাপারটি বড়ই বিস্ময়কর। তার সমস্ত বিষয়টিই কল্যাণময়। মুমিন ব্যতীত আর কারু জন্য এরূপ নেই। যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে শুকরিয়া আদায় করে। আর এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে সবর করে। আর এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়’।

(৪) আল্লাহ বলেন, ‘তাদেরকে প্রতিদানস্বরূপ দেওয়া হবে জান্নাতের সর্বোচ্চ কক্ষ এজন্য যে, তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা দেওয়া হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে’। ‘সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আশ্রয়স্থল ও আবাসস্থল হিসাবে কতইনা উৎকৃষ্ট সেটি! *(ফুরক্বান ২৫/৭৫-৭৬)*।

(৫) আল্লাহ সর্বদা ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন। যেমন তিনি বলেন, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন’ *(বাক্বারাহ ২/১৫৩)*। আর এটাই হ’ল সবচেয়ে বড় কথা। আল্লাহ আমাদের ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন- আমীন!

সর্বোত্তম জাতির বৈশিষ্ট্য :

অত্র সূরায় বর্ণিত চারটি গুণের মধ্যে শেষোক্ত দু’টি গুণ হ’ল মুসলমানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যেটি আল্লাহ অন্যত্র ‘আমর বিল মা‘রূফ ও নাহি আনিল মুনকার’ বলে অভিহিত করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, ‘তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে এ জন্যে যে, তোমরা মানুষকে ন্যায়ের আদেশ দিবে ও অন্যায়ের নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখবে’ (*আলে ইমরান ৩/১১০*)।

মূলতঃ এ কাজটিই হ’ল সর্বোত্তম জাতি হওয়ার মাপকাঠি। সৎকাজের আদেশ বা উপদেশ দেওয়া তুলনামূলকভাবে কিছুটা সহজ হ’লেও অসৎকাজে নিষেধ ও বাধা দানের কাজটা সর্বদা কঠিন। আর সেজন্যেই সেখানে সবরের কথা এসেছে। মুসলমানকে তার চিন্তায়-চেতনায়, কথায়-কর্মে, ব্যবহারে-আচরণে সর্বদা সর্বাবস্থায় ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ-এর মূলনীতি অনুসরণ করে চলতে হবে। তবেই সমাজ পরিশুদ্ধ হবে। দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা আসবে।

অবশ্য সবকিছুর মূলে হ'ল ঈমান। ঈমানে যদি ভেজাল বা দুর্বলতা বা কপটতা থাকে, তাহ'লে বাকী তিনটিতে তার প্রভাব পড়বেই। ঈমান হ'ল বীজ ও বাকীগুলি হ'ল ফলের মত। তাই ঈমান যত সঠিক, সুদৃঢ় ও সুন্দর হবে, আমল তত নিখুঁৎ, নির্ভেজাল ও স্বচ্ছ হবে। তার পরকাল আরও সুন্দর হবে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার ও সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও -আমীন!

আরেকটি জরূরী বিষয় এই যে, আল্লাহ এখানে أَوْصُوا 'তোমরা উপদেশ দাও' না বলে تَوَاصَوا 'তোমরা পরস্পরকে উপদেশ দাও' বলেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এটি প্রত্যেক মুমিনের দায়িত্ব। তাই এটা স্পষ্ট যে, সূরা আছরের একটি বড় শিক্ষা হ'ল, মুক্তির জন্য কেবল নিজের কর্ম সংশোধিত হওয়াই যথেষ্ট নয়, অপরের কর্ম সংশোধনের চেষ্টা করাও অবশ্য কর্তব্য। নইলে ক্ষতি থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। কেননা সমাজকে নিয়েই মানুষ। সমাজ অশুদ্ধ হয়ে গেলে ব্যক্তি একাকী শুদ্ধ থাকতে পারে না।

তাফসীর সমাপ্ত

প্রস্তুতি সহায়ক এই নোট তৈরী করতে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ, বিভিন্ন ভাই-বোনের দারস/নোট, ইন্টারনেট থেকে তথ্য ইত্যাদির সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ প্রত্যকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।
আমাদের এই নোটগুলোতে কোনো ধরনের ভুল পরিলক্ষিত হলে অথবা অন্য কোনো পরামর্শ থাকলে আমাদের জানাবেন ইনশাআল্লাহ।

ফুটনোট

* আল্লাহ তাআলা ‘আল আসর’ তথা সময়, হায়াত, যুগের শপথ করেছেন। এ শপথের মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে সময় ও জীবনের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন। মানুষের আয়ু কত মূল্যবান তা অনুধাবন করতে বলেছেন। তেমনি ‘আল আসর’ এর কসম করে যা বলেছেন সেটারও গুরুত্ব বুঝিয়েছেন তিনি। আর তা হল; মানুষ ক্ষতিতে নিপতিত। মানুষ ধ্বংসের দিকে ধাবিত। তাই ক্ষতির পথ ছেড়ে তাকে লাভ ও কল্যাণের পথে আসতে হবে। যারা ক্ষতিগস্ত হচ্ছে তারা কিন্তু সময়টাকে বর্ণিত কাজগুলোতে লাগাচ্ছে না বলেই তারা ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে।

* আল্লাহ তাআলা যুগের শপথ করেছেন। যুগে যুগে যা কিছু ঘটেছে সেগুলো ইতিহাস। তাতে রয়েছে মানুষের জন্য শিক্ষা ও নসিহত। যুগে যুগে অত্যাচারী শক্তিধর জাতির পতন ঘটেছে। নির্যাতিত দুর্বল জাতির উত্থান হয়েছে। এসবই মহান আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর সর্বময় ক্ষমতার প্রমাণ।

* মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকভাবে হতে পারে :

প্রথম. কুফরি করার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। [যুমার: ৬৫]
দ্বিতীয়. মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম কম হয়ে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।[মুমিনূন: ১০৩]
তৃতীয়. সত্য তথা ইসলাম গ্রহণ না করে অন্য আদর্শ গ্রহণ করে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। [আলে ইমরান: ৮৫]
চতুর্থ. ধৈর্য ধারণ না করে হতাশ হয়ে পড়ার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। [হজ : ১১]

* এ সূরার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, চারটি বিষয় অর্জন করা আমাদের জন্য জরুরি ক্ষতিগ্রস্ত থেকে বাঁচার জন্য: ১. ঈমান, ২. আমল, ৩. সত্যের উপদেশ, ৪. ধৈর্যধারণের উপদেশ,
যার মধ্যে প্রথম ২টা হলো ব্যক্তিগত মানউন্নোয়ন সম্পর্কিত। শেষের ২টা সামাজিক ভাবে করণীয়।

* **ঈমান** এর শাব্দিক অর্থ ‘বিশ্বাস’ প্রকৃত অর্থ হলো খোলা মনে নেয়া এবং নিষ্ঠাও দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করা। ঈমানের মাধ্যম হলো তিনটি- (১) অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস। (২) মুখে স্বীকৃতি তা বিশ্বাস অনুযায়ী মুখে প্রকাশ। (৩) বাস্তবে কাজে পরিণত।

*** মুমিনের বিশ্বাসের ভিত্তি হ’ল ছয়টি :** (১) আল্লাহর উপরে বিশ্বাস, (২) তাঁর ফেরেশতাগণের উপর বিশ্বাস, (৩) তাঁর প্রেরিত কিতাব সমূহের উপর বিশ্বাস, (৪) তাঁর প্রেরিত রাসূলগণের উপর বিশ্বাস, (৫) বিচার দিবসের উপর বিশ্বাস এবং (৬) আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস।

* যে কাজের মূলে ঈমান আছে এবং যা আল্লাহ ও তার রাসূল (সা:) প্রদত্ত হেদায়াতের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়েছে তা, সৎকাজ।

* আমালে সালেহ বা সৎকর্মের মধ্যে হুকুকুল্লাহ (আল্লাহর অধিকার) ও হুকুকুল ইবাদ (মানুষের অধিকার) দুটোই অন্তর্ভুক্ত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির গুরুত্ব দেয়ায় কাজ হবে না। তাওহিদে বিশ্বাস, ঈমানে কামেল, ইবাদত-

বন্দেগি, ফরজ-ওয়াজিব ও সুন্নাত-মুস্তাহাব আমলগুলো যেমন সৎকর্ম তেমনি পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, আত্নীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, সহকর্মী-সহযাত্রীদের সঙ্গে সদাচারণ, তাদের অধিকার সংরক্ষণ করাও সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত।

* আমল কবুল হওয়ার শর্ত হ'ল তিনটি : (১) আক্বীদা বিশুদ্ধ হওয়া (২) তরীকা সঠিক হওয়া এবং (৩) ইখলাছে আমল

* পরস্পরকে আল্লাহ প্রেরিত 'হক' তথা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার উপদেশ দিতে হবে।

* 'সবর' তিন প্রকার : (১) বিপদে সবর করা (২) পাপ থেকে সবর করা অর্থাৎ বিরত থাকা (৩) আল্লাহর আনুগত্যে সবর করা অর্থাৎ দৃঢ় থাকা

* وْصُوا'তোমরা উপদেশ দাও' না বলে تَوَاصَوا'তোমরা পরস্পরকে উপদেশ দাও' বলেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এটি প্রত্যেক মুমিনের দায়িত্ব। তাই এটা স্পষ্ট যে, সূরা আছরের একটি বড় শিক্ষা হ'ল, মুক্তির জন্য কেবল নিজের কর্ম সংশোধিত হওয়াই যথেষ্ট নয়, অপরের কর্ম সংশোধনের চেষ্টা করাও অবশ্য কর্তব্য। নইলে ক্ষতি থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। কেননা সমাজকে নিয়েই মানুষ। সমাজ অশুদ্ধ হয়ে গেলে ব্যক্তি একাকী শুদ্ধ থাকতে পারে না।

* সাহাবীগণের মধ্যে দুই ব্যক্তি ছিলেন, তারা পরস্পর মিলে একজন অন্যজনকে সূরা আসর পাঠ করে না শুনানো পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতেন না।